রঙ্গরসের সচিত্র গল্প

নতুন সাঁকো

দুই পাড়ার হাসি, ঝগড়া ও মিলনের গল্প

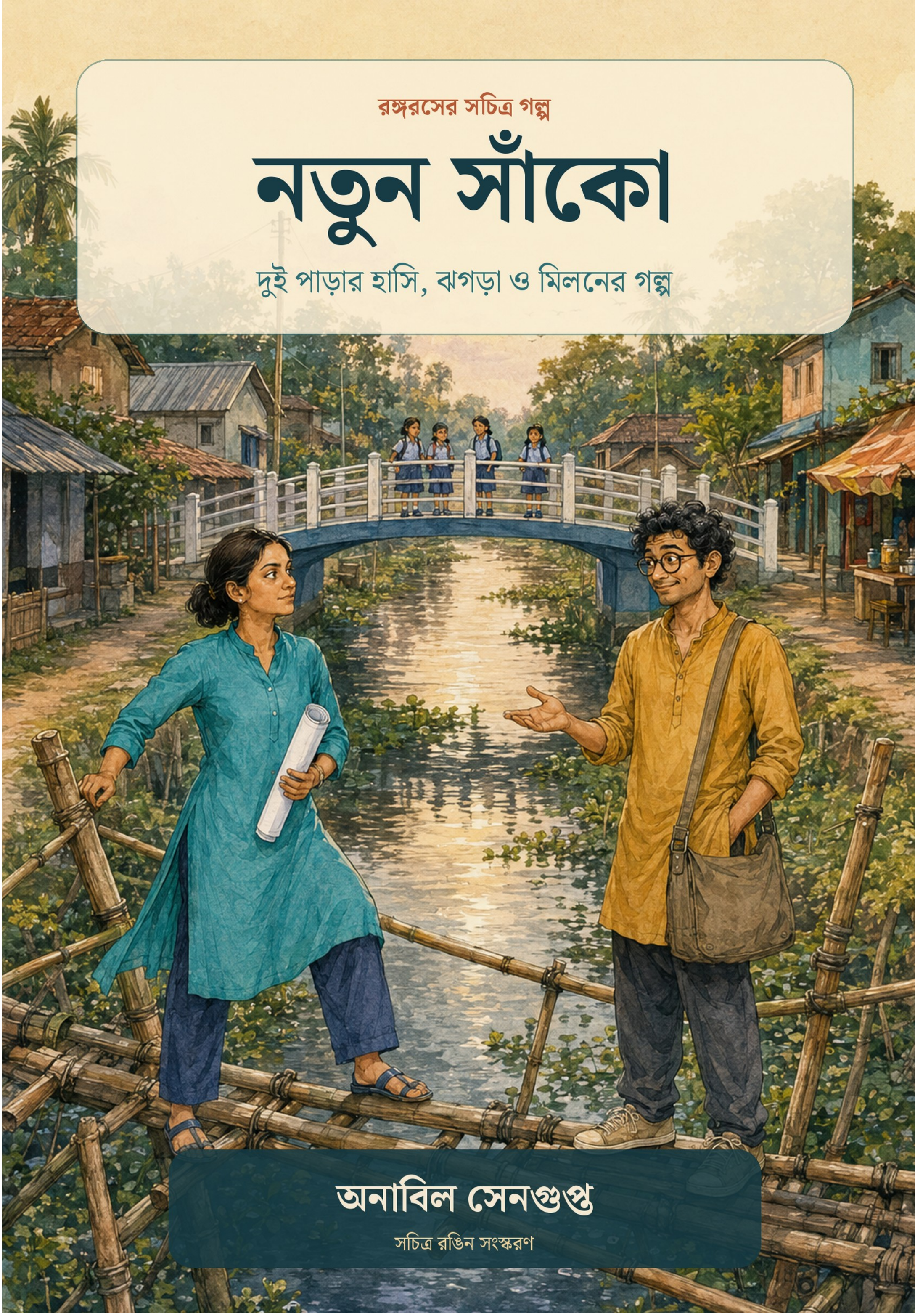

অনাবিল সেনগুপ্ত

সচিত্র রঙিন সংস্করণ

নতুন সাঁকো

একটি খাল, দুই পাড়া, এক সাঁকো, আর বিরোধের শেষ নেই

অনাবিল সেনগুপ্ত

পূর্ণ রঙিন সচিত্র সংস্করণ ২০২৬

প্রকাশনা ও স্বত্ব

শিরোনাম	নতুন সাঁকো
রচনা	অনাবিল সেনগুপ্ত
সংস্করণ	পূর্ণ রঙিন সচিত্র সংস্করণ
প্রথম সচিত্র প্রকাশ	২০২৬
প্রকাশনা	স্বপ্রকাশিত ডিজিটাল সংস্করণ
ওয়েবসাইট	anabilsengupta.com
বাংলা মুদ্রাক্ষর	Noto Serif Bengali

© ২০২৬ অনাবিল সেনগুপ্ত। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সমালোচনা, গবেষণা, সংবাদ পর্যালোচনা ও শিক্ষামূলক আলোচনায় যুক্তিসঙ্গত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ছাড়া লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রচার করা যাবে না।

এই বইয়ের চরিত্র, সংলাপ ও ঘটনাবলি সাহিত্যিক নির্মাণের অংশ। বাস্তব কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে মিল অনিচ্ছাকৃত।

এই সংস্করণের চিত্র ও গ্রাফিক নির্মাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। দৃশ্য পরিকল্পনা, শিল্প নির্দেশনা, নির্বাচন, সংশোধন, রং সমন্বয়, বাংলা টাইপোগ্রাফি এবং চূড়ান্ত সম্পাদনা মানব তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

কিছু কথা

একটি সাঁকো কেবল খালের দুই পারকে যুক্ত করে না। কখনো কখনো সেটি মানুষের জেদ, ভয়, অভিমান, হাসি এবং একসঙ্গে পথ চলার সম্ভাবনাকেও মাঝখানে এনে দাঁড় করায়।

নতুন সাঁকোর শুরু একটি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে। কিন্তু গল্পটি এগোতে এগোতে বোঝা যায়, সবচেয়ে দুর্বল কাঠামোটি খালের ওপরে নয়। সেটি গড়ে ওঠে মানুষের মনে, পুরোনো বিরোধে, অহংকারে এবং কে আগে এগোবে সেই অন্তহীন হিসাবের মধ্যে।

উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার ঝগড়া, প্রবীরবাবু ও হারাধনবাবুর সম্মানরক্ষা, ঈশানীর পেশাগত বাস্তবতা, অর্কের সহজাত রঙ্গরস এবং পিউর নির্ভীক সরলতা মিলিয়ে এই গল্পের জগৎ তৈরি হয়েছে। এখানে সেতুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ভারবহন ক্ষমতা মাপা যায়। মানুষের সম্পর্কের ভারবহন ক্ষমতা মাপার কোনো যন্ত্র নেই।

এই গল্পে হাসি আছে। সেই হাসির আড়ালে আছে আমাদের পরিচিত সমাজ, ছোট ছোট ক্ষমতার লড়াই, অকারণ বিভাজন এবং বিপদের সময়ে হঠাৎ এক হয়ে যাওয়ার মানবিক শক্তি। পাঠক যদি হাসতে হাসতে একবার ভাবেন, আমাদের মাঝখানের সাঁকোগুলো কতটা মজবুত, তাহলেই এই গল্পের যাত্রা সার্থক হবে।

অনাবিল সেনগুপ্ত

সূচিপত্র

কিছু কথা

গল্পের মানুষজন

গল্পের ভূগোল

১	সাঁকোর সঙ্গে শত্রুতা
২	উত্তরপাড়া বনাম দক্ষিণপাড়া
৩	সেতুর সভা এবং সিঙাড়ার সংকট
৪	খালের জল বাড়ে
৫	সেতুর নকশার বাইরে
৬	উদ্বোধনের দিন

শেষে লেখক পরিচিতি ও নির্মাণ স্বীকৃতি

দুই পাড়ার মাঝখানে

সবচেয়ে কঠিন সেতুটি খালের ওপরে নয়।

মানুষের অভিমানের ওপরে।

হাসি, ঝগড়া ও একসঙ্গে হাঁটার গল্প

গল্পের মানুষজন

একটি সাঁকো ঘিরে সাতজন মানুষের হাসি, জেদ এবং নির্ভরতার গল্প।

ঈশানী

ব্লক অফিসের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। নকশা, নিরাপত্তা এবং অর্কের কথার ভার একসঙ্গে সামলান।

পিউ

দুই পাড়ার ছোট্ট সাহসী স্কুলছাত্রী। বড়দের তর্কের চেয়ে তার প্রশ্ন অনেক বেশি কাজের।

হারাধনবাবু

দক্ষিণপাড়ার সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাস শিক্ষক। প্রত্যেক বিরোধের পেছনে ইতিহাস খুঁজে পান।

অর্ক

দক্ষিণপাড়ার পাঠাগারের দায়িত্বে। সাঁকোর স্বঘোষিত পরামর্শদাতা এবং কথার অননুমোদিত সরবরাহকারী।

প্রবীরবাবু

উত্তরপাড়ার আজীবন সম্পাদক। হিসাব, মর্যাদা এবং সন্দেহ তিনটিই নিখুঁতভাবে রাখেন।

শর্মিলা ও কণিকা

দুই পরিবারের আসল প্রশাসন। প্রয়োজন হলে সিঙাড়া, সমুচা এবং সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে পরিবেশন করেন।

গল্পের ভূগোল

উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার মাঝখানে খাল। আর খালের মাঝখানেই গল্পের সবচেয়ে ব্যস্ত চরিত্র, পুরোনো সাঁকো।

দূরত্ব সাড়ে তিন কিলোমিটার নয়। দূরত্ব আসলে কে আগে হাত বাড়াবে, সেই হিসাবের।

১. সাঁকোর সঙ্গে শত্রুতা

“যে বিষয়ে কারও দায়িত্ব থাকে না, সে বিষয়ে আমাদের দেশে সবাই পরামর্শদাতা।”

প্রথম পরিদর্শনেই সাঁকো এবং ঈশানী পরস্পরকে সহজভাবে নেয়নি।

বাঁশের সাঁকোটাকে প্রথম দেখেই ঈশানীর মনে হয়েছিল, ওটা নিশ্চয়ই কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন শিল্পীর ইনস্টলেশন।

চারটি রোগা বাঁশ পাশাপাশি শুয়ে আছে। নিচে কুচকুচে কালো খাল। দুপাশে দড়ির বদলে ঝুলছে ছেঁড়া নীল নাইলনের জাল। সাঁকোর মাঝখানে একটি বাঁশ এমনভাবে নিচু হয়ে আছে, যেন পথচারী উঠলেই সে শেষবারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে দায়িত্ব থেকে অবসর নেবে।

ঈশানী সাঁকোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “এটা দিয়ে মানুষ পার হয়?”

পাশের চায়ের দোকান থেকে একজন উত্তর দিল, “না। সাধারণত হাঁস যায়। মানুষ মাঝেমধ্যে চেষ্টা করে।”

ঈশানী ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল।

পাতলা চেহারা। অগোছালো চুল। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। এক হাতে চায়ের ভাঁড়, অন্য হাতে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া মুড়ি। লোকটা নির্বিকার মুখে মুড়ি চিবোচ্ছিল।

ঈশানী বলল, “আপনি খুব মজা পেলেন?”

“এখনো পাইনি। আপনি সাঁকোয় উঠলে পেতে পারি।”

“আমি উঠব কেন?”

“ওপারে যাবেন বলে।”

“আমি ঘুরে রাস্তা দিয়ে যাব।”

“সাড়ে তিন কিলোমিটার।”

“তাতে আপনার কী?”

“আমার কিছু না। হাঁটবেন আপনি। স্বাস্থ্যও আপনার ভালো হবে।”

ঈশানী এবার লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

“শুনুন, আমি এই সাঁকোর পরিদর্শনে এসেছি।”

লোকটি প্রথমবার আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকাল।

“আপনি ইঞ্জিনিয়ার?”

“হ্যাঁ। ব্লক অফিস থেকে এসেছি।”

“ও।”

একটি মাত্র ‘ও’।

সেই 'ও' শব্দটির মধ্যে ঈশানী স্পষ্ট শুনতে পেল সন্দেহ, হতাশা, অবিশ্বাস এবং সরকারি ব্যবস্থার প্রতি সাত পুরুষের জমে থাকা ক্ষোভ।

ঈশানী বলল, "ও মানে?"

"কিছু না। গত পাঁচ বছরে চারজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন। সবাই ছবি তুলে গেছেন। একজন তো সাঁকোর সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে সেলফি তুলেছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল সাঁকোটা তিনিই বানিয়েছেন।"

"আমি সেলফি তুলতে আসিনি।"

"তাহলে ভালো। তবে জুতোটা খুলে নিন।"

"কেন?"

"সাঁকোয় শ্যাওলা আছে।"

"আমি সাঁকোয় উঠব না।"

"তাহলে পরিদর্শন করবেন কীভাবে?"

লোকটি কথাটা বলেই চায়ের শেষ চুমুক দিল। তারপর ভাঁড়টি দোকানের পাশে রাখা বালতিতে ফেলে সাঁকোর দিকে এগিয়ে গেল।

"আসুন।"

"আপনি কে?"

"অর্ক রায়। দক্ষিণপাড়ার পাঠাগারের দায়িত্বে আছি। আর এই সাঁকোর অস্থায়ী পরামর্শদাতা।"

"সাঁকোর আবার পরামর্শদাতা হয়?"

"হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে কারও দায়িত্ব থাকে না, সে বিষয়ে আমাদের দেশে সবাই পরামর্শদাতা।"

অর্ক জুতো খুলে হাতে নিল। তারপর অনায়াসে সাঁকোয় উঠে পড়ল।

মাঝখানে গিয়ে সে ফিরে তাকাল।

“ভয় পাচ্ছেন?”

ঈশানী জুতো খুলতে খুলতে বলল, “ভয় নয়। আমি ঝুঁকি বিশ্লেষণ করছি।”

“পড়ে গেলে খালের গভীরতা কোমর পর্যন্ত।”

“আমি সাঁতার জানি।”

“তার দরকার হবে না। খালের জল এত ঘন যে আপনি নিজে থেকেই ভেসে থাকবেন।”

ঈশানী দাঁত চেপে সাঁকোয় পা রাখল।

প্রথম দুই পদক্ষেপ ভালোভাবেই গেল। তৃতীয় পা ফেলতেই বাঁশটি কেঁপে উঠল। চতুর্থ পা ফেলেই ঈশানীর মনে হলো, তার সরকারি চাকরি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত আত্মসম্মান একসঙ্গে খালের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অর্ক হাত বাড়িয়ে দিল।

“ধরুন।”

“দরকার নেই।”

“ঠিক আছে। নিচে পড়লে তখন ধরব।”

ঈশানী হাতটা ধরল।

অর্কের মুখে কোনো বিজয়ীর হাসি ছিল না। সেটাই ঈশানীর আরও বেশি বিরক্তির কারণ হলো।

ওপারে পৌঁছে ঈশানী হাত ছাড়িয়ে বলল, “সাঁকোটা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।”

অর্ক বলল, “তাহলে দুই পাড়ার স্কুলের বাচ্চারা যাবে কীভাবে?”

“নতুন সেতু না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করবে।”

“সাড়ে তিন কিলোমিটার ঘুরে?”

“নিরাপত্তার প্রশ্নে দূরত্ব গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

“কথাটা আপনি অফিসের গাড়িতে বসে বলছেন বলে সুন্দর শোনাচ্ছে।”

ঈশানী এবার চুপ করে গেল।

অর্কও আর কিছু বলল না।

খালের ওপারে মাটির রাস্তা ধরে কয়েকজন স্কুলপড়ুয়া আসছিল। তাদের কারও পায়ে জুতো নেই। কারও কাঁধে ছেঁড়া ব্যাগ। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি সাঁকোর সামনে এসে ব্যাগটি বড় ছেলেটির হাতে দিল। তারপর দুই হাত ছড়িয়ে ভারসাম্য রেখে হাঁটতে শুরু করল।

ঈশানী মেয়েটির পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

অর্ক মৃদুস্বরে বলল, “ওর নাম পিউ। গত বর্ষায় পড়ে গিয়েছিল। তারপরও রোজ এভাবেই যায়।”

“গ্রামের লোকজন মিলে নতুন সাঁকো বানাননি কেন?”

“দুই পাড়ার লোকজন একসঙ্গে কিছু করে না।”

“কেন?”

অর্ক খালের দুই দিক দেখিয়ে বলল, “ওপারে উত্তরপাড়া। এপারে দক্ষিণপাড়া। উত্তরপাড়ার দাবি, খালের জমি তাদের। দক্ষিণপাড়ার দাবি, সাঁকো ব্যবহার করে সবাই, তাই খরচও সবাই দেবে। গত বছর বাঁশ কেনা হয়েছিল। কোন পাড়ার মাঠে বাঁশ রাখা হবে, সেটা ঠিক করতে তিনটি সভা হয়েছিল। চতুর্থ সভার আগের রাতে বাঁশগুলো চুরি হয়ে যায়।”

“চোর ধরা পড়েনি?”

“দুই পাড়াই বলেছে অন্য পাড়া চুরি করেছে।”

“আসলে?”

“পরে দেখা যায়, পঞ্চায়েতের এক সদস্য বাঁশগুলো নিজের শ্যালকের মুরগির খামারে লাগিয়েছেন।”

“তারপর?”

“তিনি বলেছেন, বাঁশগুলো সেখানে সাময়িকভাবে নিরাপদে রাখা হয়েছিল।”

“মুরগির খামারে?”

“মুরগিগুলো নাকি নিরপেক্ষ সাক্ষী।”

ঈশানী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“আপনাদের সমস্যা সাঁকো নয়।”

অর্ক মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক ধরেছেন। আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই।”

২. উত্তরপাড়া বনাম দক্ষিণপাড়া

“ওদের বাড়ির পেছনে গোরু বাঁধা থাকে, সামনে ইংরেজিতে নাম লেখা। এই হলো আধুনিকতা।”

পারিবারিক ইতিহাসের অপ্রকাশিত অধ্যায় খাবার টেবিলেই খুলে গেল।

ঈশানীর বাড়ি উত্তরপাড়ায়।

তার বাবা প্রবীর চক্রবর্তী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী এবং উত্তরপাড়া নাগরিক কল্যাণ সমিতির আজীবন সম্পাদক। এই ‘আজীবন’ শব্দটি সমিতির নিয়মে ছিল না। প্রবীরবাবু নিজ উদ্যোগে যোগ করেছিলেন।

সমিতির শেষ নির্বাচন হয়েছিল বারো বছর আগে। সেবার তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মনোনয়ন জমা দেয়নি। কারণ মনোনয়নপত্র তাঁর কাছেই রাখা ছিল এবং জমা দেওয়ার শেষ দিনটির কথা তিনি কাউকে জানাননি।

প্রবীরবাবু বিশ্বাস করতেন, দক্ষিণপাড়ার লোকেরা তিনটি বিষয়ে ভয়ংকর।

প্রথমত, তারা মাইকে গান চালালে শব্দ কমায় না।

দ্বিতীয়ত, তারা ফুটবল খেলতে গিয়ে বল উত্তরপাড়ায় পাঠালে ফেরত চায়।

তৃতীয়ত, তারা কথায় কথায় উত্তরপাড়ার লোকজনকে 'বাবু' বলে ডাকে।

প্রবীরবাবুর মতে, 'বাবু' শব্দটি সম্মানসূচক নয়। এটি রাজনৈতিক অপমান।

অন্যদিকে অর্কের বাবা হারাধন রায় দক্ষিণপাড়া উন্নয়ন মঞ্চের সভাপতি। পেশায় উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষক ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর ইতিহাস পড়ানো বন্ধ করলেও ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা ছাড়েননি।

হারাধনবাবুর মতে, উত্তরপাড়ার লোকেদের প্রধান সমস্যা তাদের বাড়ির সামনে টবে মানিপ্ল্যান্ট আছে বলে তারা নিজেদের শহুরে মনে করে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, "ওদের বাড়ির পেছনে গোরু বাঁধা থাকে, সামনে ইংরেজিতে নাম লেখা। এই হলো আধুনিকতা।"

দক্ষিণপাড়া উন্নয়ন মঞ্চের কোনো লিখিত সংবিধান ছিল না। হারাধনবাবু বলতেন, ভারতেরও একসময় সংবিধান ছিল না, তবু দেশ চলেছে। কেউ তাঁকে মনে করিয়ে দিত না যে তখন দেশটি তাঁর সভাপতিত্বে চলেনি।

ঈশানী বাড়ি ফিরে সাঁকোর কথা তুলতেই প্রবীরবাবু বললেন, "নতুন সেতু অবশ্যই হবে। তবে একটু উত্তরের দিকে করতে হবে।"

"কেন?"

"বর্তমান সাঁকোটা দক্ষিণপাড়ার জমিতে বেশি পড়েছে।"

"সেতু কি জমির রাজনৈতিক ভারসাম্য মেপে বানানো হয়?"

"তুই বুঝবি না। এখানে দীর্ঘদিনের ইতিহাস আছে।"

ঈশানীর মা শর্মিলা খাবার টেবিলে ডাল রাখতে রাখতে বললেন, "ইতিহাস নয়। তোমার বাবা আর অর্কের বাবা ছোটবেলায় একই মেয়েকে পছন্দ করত। সেই থেকে ঝামেলা।"

প্রবীরবাবু প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন।

"কী যা তা বলছ!"

"আমি কিছুই বলছি না। পুরো গ্রাম জানে।"

ঈশানী ভুরু তুলল।

"মেয়েটি কে?"

শর্মিলা বললেন, "তোর কাকিমা।"

"কোন কাকিমা?"

"অর্কের মা।"

প্রবীরবাবু টেবিলে হাত চাপড়ে বললেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যা! বিভ্রান্তিকর প্রচার! আমি তোর মাকে বিয়ের আগে অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাইনি।"

শর্মিলা শান্তভাবে বললেন, "আমার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল তিরিশ বছর বয়সে। তার আগে তুমি পৃথিবীর সব মেয়েকে বোনের চোখে দেখতে, তাই তো?"

"আমি আদর্শবান যুবক ছিলাম।"

"তোমার লেখা চিঠি এখনো কণিকা রেখে দিয়েছে।"

প্রবীরবাবু এবার ভাত খেতে শুরু করলেন। ইতিহাসের এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা এগোনো তাঁর পক্ষে নিরাপদ মনে হলো না।

ঈশানী বলল, "সেতু বর্তমান জায়গাতেই হবে। দুই পাড়ার সুবিধা বিবেচনা করে নকশা হবে। আগামী রবিবার যৌথ সভা ডাকছি।"

প্রবীরবাবু চমকে উঠলেন।

"যৌথ সভা? দক্ষিণপাড়ার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের মঞ্চে?"

"না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে।"

"ওটা নিরপেক্ষ জায়গা নয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দক্ষিণপাড়ায় থাকেন।"

"স্কুলটা কোন পাড়ায়?"

"উত্তরপাড়ায়।"

"তাহলে ভারসাম্য হয়ে গেল।"

প্রবীরবাবু বললেন, "এত সহজে ভারসাম্য হয় না।"

"তাহলে খালের মধ্যে সভা করি?"

শর্মিলা হেসে ফেললেন।

প্রবীরবাবু হাসলেন না। তিনি মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুই ওই অর্ক ছেলেটার সঙ্গে ঘুরছিলি কেন?"

"সাঁকো দেখাচ্ছিল।"

"সাঁকো দেখানোর আর লোক ছিল না?"

"ছিল। হাঁসগুলো ব্যস্ত ছিল।"

প্রবীরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ছেলেটা বেশি কথা বলে।"

শর্মিলা বললেন, "তোমার সামনে আর কেউ কথা বললেই তোমার এমন মনে হয়।"

পরদিন দক্ষিণপাড়ার বাড়িতেও একই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

হারাধনবাবু অর্ককে বললেন, "উত্তরপাড়ার ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটি কেমন?"

অর্ক বলল, "কাজ বোঝে।"

"আমি স্বভাব জানতে চেয়েছি।"

"স্বভাবও কাজ বোঝে।"

কণিকা রান্নাঘর থেকে বললেন, "সুন্দর কি না জিজ্ঞেস করো। এত ঘুরিয়ে কথা বলছ কেন?"

হারাধনবাবু প্রতিবাদ করলেন, "আমি ছেলের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না।"

অর্ক বলল, "তুমি গত সপ্তাহে আমার আলমারি খুলে দেখেছিলে।"

"ওটা ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ নয়। মোজা খুঁজছিলাম।"

"তোমার মোজা আমার আলমারিতে কেন থাকবে?"

হারাধনবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "এই কারণেই তো খুঁজছিলাম।"

৩. সেতুর সভা এবং সিঙাড়ার সংকট

"কয়েকজন এত দ্রুত শান্ত হয়ে গেল যে মনে হলো গ্রামের ঐক্যের আসল প্রকল্প সেতু নয়, আলুর পুর।"

সেতুর সভা অল্প সময়েই আলুর পুরের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পরিণত হলো।

রবিবারের সভায় দুই পাড়ার মোট একশো আটত্রিশজন মানুষ উপস্থিত হলো। সেতু নিয়ে আগ্রহী ছিল সম্ভবত আঠারোজন। বাকিরা এসেছিল প্রতিপক্ষ কী বলে, তা শুনতে এবং পরে সেই কথার সুবিধাজনক অংশটুকু বদলে অন্যদের বলতে।

সভায় বসার জন্য মাঠে মোট ছাব্বিশটি চেয়ার রাখা হয়েছিল।

প্রথম সমস্যা দেখা দিল সেতু নিয়ে নয়, চেয়ার নিয়ে।

প্রবীরবাবু দাবি করলেন, সামনের সারিতে উত্তরপাড়ার লোকজন বসবে। কারণ সভাস্থলটি উত্তরপাড়ার জমিতে।

হারাধনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “মাঠ আপনাদের হতে পারে, কিন্তু চেয়ারগুলো আমাদের ক্লাব থেকে এসেছে।”

প্রবীরবাবু বললেন, “চেয়ারের পায়া চারটি বলেই তার চারজন মালিক হয় না।”

হারাধনবাবু উত্তর দিলেন, “তাহলে আপনার বাড়িতে চারপায়া খাট আছে বলে পুরো উত্তরপাড়ার লোক সেখানে ঘুমোয় না কেন?”

সভা শুরু হওয়ার আগেই চেয়ারগুলো সাংবিধানিক সংকটে পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ঈশানী বলল, “কেউ চেয়ারে বসবেন না। সবাই দাঁড়িয়ে সভা করুন।”

প্রবীরবাবু বললেন, “আমাদের বয়স হয়েছে।”

হারাধনবাবু বললেন, “বয়স তো শুধু আপনাদের হয়নি। দক্ষিণপাড়ার মানুষ জন্মানোর পর আর বড় হয় না নাকি?”

ঈশানী উত্তর দিল, “সবাই দাঁড়িয়ে থাকলে সমতা বজায় থাকবে।”

হারাধনবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “এই প্রথম আপনার মেয়ের সঙ্গে একমত হলাম।”

প্রবীরবাবু বললেন, “আপনার সম্মতি কেউ চায়নি।”

“চায়নি বলে কি ভালো কথা বলা বন্ধ রাখব?”

“আপনি ভালো কথা বলেন কবে?”

“আপনি যখন শোনেন না, ঠিক তখনই।”

সভা শুরু হলো।

ঈশানী একটি বড় নকশা খুলে বোঝাল, দশ মিটার দীর্ঘ এবং দেড় মিটার প্রশস্ত একটি পাকা পদচারী সেতু হবে। দুই পাশে রেলিং থাকবে। বর্ষার সর্বোচ্চ জলস্তরের ওপরে ডেক রাখা হবে। সেতুর সঙ্গে দুই দিকের সংযোগপথও উঁচু করা হবে।

পেছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, “মোটরসাইকেল যাবে?”

ঈশানী বলল, “না।”

লোকটি হতাশ হয়ে বলল, “তাহলে লাভ কী?”

“শিশু, বৃদ্ধ এবং পথচারীরা নিরাপদে যাতায়াত করবে।”

“কিন্তু মোটরসাইকেল না গেলে আমরা যাব কীভাবে?”

অর্ক বলল, “হেঁটে।”

লোকটি এমনভাবে অর্কের দিকে তাকাল, যেন তাকে আধুনিক সভ্যতা ছেড়ে পূর্বপুরুষের পেশায় ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “সাইকেল?”

ঈশানী বলল, “হাতে ধরে নেওয়া যাবে।”

লোকটি গভীর উদ্বেগে বলল, “সাইকেলকে হাতে ধরে নিয়ে গেলে লোকে কী ভাববে?”

অর্ক বলল, “ভাববে সাইকেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো।”

ভিড়ের মধ্যে হাসির ঢেউ উঠল।

এক বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, “গোরু যাবে?”

ঈশানী বলল, “সেতুটি পথচারীদের জন্য।”

বৃদ্ধ বললেন, “গোরুও তো হেঁটেই যায়।”

অর্ক বলল, “গোরু আবেদন করলে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে।”

এরপর সেতুর রং নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

উত্তরপাড়া চাইল নীল রং। দক্ষিণপাড়া চাইল সবুজ।

প্রবীরবাবু বললেন, “নীল রং দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।”

হারাধনবাবু বললেন, “সবুজ চোখের পক্ষে আরামদায়ক।”

"সেতু দেখতে যাবেন, না ঘুমোতে যাবেন?"

"নীল দেখে চোখ ধাঁধিয়ে খালে পড়ার চেয়ে ঘুমিয়ে পড়া নিরাপদ।"

ঈশানী বলল, "রং পরে ঠিক হবে।"

"পরে মানে কবে?" প্রবীরবাবু জানতে চাইলেন।

"সেতু তৈরি হওয়ার পরে।"

হারাধনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বিপজ্জনক কথা। আগে রং ঠিক না করলে সেতু ভুল রঙের হয়ে যেতে পারে।"

অর্ক বলল, "সেতু তৈরি হওয়ার আগেই রং করলে অবশ্য খরচ কমবে। বাতাসে দুবার ব্রাশ চালিয়ে দিলেই হবে।"

হারাধনবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ আছে।"

অর্ক বলল, "আপনার অনুমানশক্তি খুব ভালো।"

এরপর সেতুর নাম নিয়ে আসল যুদ্ধ শুরু হলো।

উত্তরপাড়া চাইল 'উত্তরপাড়া জনকল্যাণ সেতু'।

দক্ষিণপাড়া চাইল 'দক্ষিণপাড়া সংহতি সেতু'।

একজন প্রস্তাব দিলেন, দুই পাড়ার নাম মিলিয়ে 'উত্তর দক্ষিণ মৈত্রী সেতু' রাখা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন আপত্তি করল, "উত্তর আগে কেন?"

তৃতীয়জন বলল, "দক্ষিণ আগে রাখলে মানচিত্রের নিয়ম ভাঙবে।"

চতুর্থজন বলল, "মানচিত্রে ওপর নিচ আছে, আগে পরে নেই।"

পঞ্চমজন জানতে চাইল, "ফলকটা কোন পাড়ার দিকে মুখ করে বসবে?"

ষষ্ঠজন বলল, "দুই দিকে দুটি ফলক বসানো হোক।"

প্রবীরবাবু বললেন, "তাহলে খরচ দ্বিগুণ হবে।"

হারাধনবাবু বললেন, “সম্মানের হিসাব ব্যাঙ্কের সুদের মতো করা যায় না।”

ফলকের প্রসঙ্গ উঠতেই সভা দশ মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

ঈশানী বলল, “সেতুর নাম এখন ঠিক হচ্ছে না।”

হারাধনবাবু বললেন, “নাম ছাড়া উন্নয়ন হয় না।”

অর্ক পেছন থেকে বলল, “আগে উন্নয়নটা হোক। নাম পরে তাকে খুঁজে নেবে।”

প্রবীরবাবু কটমট করে তাকালেন।

“তুমি সব বিষয়ে কথা বলছ কেন?”

অর্ক শান্তভাবে বলল, “আমার মুখ আছে বলে।”

“মুখ থাকলেই কথা বলতে হয় না।”

“আপনারও তো আছে।”

সভা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ঠিক তখন শর্মিলা ও কণিকা বড় দুটি থালা নিয়ে মাঠে ঢুকলেন। দুই থালাতেই ছিল একই আলুভরা ত্রিভুজাকৃতি খাবার। উত্তরপাড়ায় যার নাম সিঙাড়া, দক্ষিণপাড়ায় সমুচা।

খাবার দেখামাত্র উত্তেজনা খানিকটা কমল। কয়েকজন এত দ্রুত শান্ত হয়ে গেল যে মনে হলো গ্রামের ঐক্যের আসল প্রকল্প সেতু নয়, আলুর পুর।

কিন্তু সেই শান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

প্রবীরবাবু থালা থেকে একটি তুলে নিয়ে বললেন, “এটা আবার কী?”

হারাধনবাবু বললেন, “সমুচা।”

“আলু ভরা ত্রিভুজ জিনিসটার নাম সিঙাড়া।”

“আপনারা নাম বদলে খেতে অভ্যস্ত। আমরা আসল নাম জানি।”

“আসল নামের প্রমাণ আছে?”

“ইতিহাস আছে।”

“সব বিষয়ে ইতিহাস টানবেন না।”

“আপনারা তো সব বিষয়ে ব্যাঙ্কের হিসাব টানেন।”

প্রবীরবাবু খাবারটি ঘুরিয়ে দেখে বললেন, “এর আকৃতি সিঙাড়ার মতো।”

হারাধনবাবু বললেন, “আকৃতি দেখে নাম হলে আপনার মাথার নাম নারকেল হতো।”

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেতুর সভা সিঙাড়া বনাম সমুচা সম্মেলনে পরিণত হলো।

দুই পক্ষই একই খাবার খেতে খেতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল, অন্য পক্ষ খাবারটির নাম ভুল জানে।

ঈশানী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল।

অর্ক তার পাশে একটি কাগজের ঠোঙা এগিয়ে দিল।

“খাবেন?”

“কী আছে?”

“বিতর্কিত খাদ্যবস্তু।”

ঈশানী একটা তুলে নিয়ে বলল, “আমি এটাকে সিঙাড়া বলি।”

অর্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সম্পর্ক শুরু হওয়ার আগেই এত বড় মতপার্থক্য ভালো লক্ষণ নয়।”

ঈশানীর হাত থেমে গেল।

“কোন সম্পর্ক?”

“সেতু নির্মাণ কমিটির সম্পর্ক।”

“ও।”

ঈশানী খাবারে কামড় দিল।

অর্ক মৃদু হেসে বলল, “আপনি অন্য কিছু ভেবেছিলেন?”

“না।”

“আমিও না।”

দুজনেই তারপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ চুপ করে রইল।

ওদিকে প্রবীরবাবু দ্বিতীয়টি তুলে বলছিলেন, “আমি শুধু পরীক্ষার জন্য আরেকটা নিচ্ছি।”

হারাধনবাবু বললেন, “নাম না মেনে খাবারটা খাবেন না।”

প্রবীরবাবু উত্তর দিলেন, “শত্রুপক্ষের প্রমাণ নষ্ট করছি।”

সভা শেষ হওয়ার পর ঈশানী কার্যবিবরণী লিখল:

‘সেতুর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নীতিগত ঐকমত্য হয়েছে। নাম, রং, ফলকের দিক এবং পরিবেশিত খাদ্যবস্তুর পরিচয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।’

অর্ক লেখাটি পড়ে বলল, “খুব সফল সভা।”

ঈশানী বলল, “কোন দিক থেকে?”

“কেউ কাউকে চেয়ার দিয়ে মারেনি।”

৪. খালের জল বাড়ে

"সেই প্রথম দুই পাড়ার মানুষ পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে একই দিকে শক্তি প্রয়োগ করেছিল।"

বিপদের মুহূর্তে দুই পাড়ার সব হাত একই দড়িতে এসে মিলল।

বর্ষা সে বছর সরকারি ক্যালেন্ডার, স্থানীয় অনুমান কিংবা হারাধনবাবুর হাঁটুর ব্যথা, কোনোটারই হিসাব মেনে এলো না।

এক রাতের টানা বৃষ্টিতে খালের জল বাঁশের সাঁকোর গা ছুঁয়ে ফেলল। সকালে স্কুল বন্ধ ছিল। তবু পিউ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওষুধ আনতে। তার দাদুর জ্বর।

সাঁকোর মাঝখানে পৌঁছতেই পুরোনো একটি বাঁশ ভেঙে গেল।

পিউ খালে পড়ে যায়নি। ছেঁড়া জালের সঙ্গে তার জামা আটকে গিয়েছিল। কিন্তু জল ক্রমে বাড়ছিল এবং সাঁকোর বাকি অংশটাও কাঁপছিল।

খবর পেয়ে দুই পাড়ার মানুষ খালের ধারে জড়ো হলো।

সবাই চিৎকার করছিল। কেউ দড়ি আনতে বলছিল, কেউ নৌকা। কেউ বাঁশ আনতে বলছিল। একজন বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে এসেছিল। সে নিজেও বুঝতে পারছিল না, ছাতাটি দিয়ে ঠিক কী করবে।

দুই পাড়ার লোকজন পরস্পরকে নির্দেশ দিচ্ছিল, কিন্তু কেউ জলে নামছিল না।

প্রবীরবাবু চিৎকার করলেন, "দক্ষিণপাড়ার দিক থেকে নামলে সুবিধা হবে।"

হারাধনবাবু বললেন, "মেয়েটা উত্তরপাড়ার। আপনারাই আগে যান।"

"এখন পাড়া দেখছেন?"

"আপনিই তো দিকনির্দেশ করছেন!"

অর্ক পৌঁছেই জুতো খুলে ফেলল।

ঈশানী তার হাত চেপে ধরল।

"তুমি নামবে না। স্রোত আছে।"

"পিউ বেশিক্ষণ ঝুলতে পারবে না।"

"দড়ি বাঁধো।"

দুই পাড়ার মানুষের কোমরে বাঁধা কাপড়, গামছা এবং একটি গোরু বাঁধার মোটা দড়ি জুড়ে লম্বা রশি তৈরি হলো। একটি লাল গামছার মালিক বারবার বলে দিলেন, উদ্ধার শেষ হলে গামছাটি যেন তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়।

এক প্রান্ত অর্কের কোমরে বাঁধা হলো। অন্য প্রান্ত ধরে দাঁড়াল দুই পাড়ার প্রায় কুড়িজন মানুষ।

ঈশানী বলল, “সোজা যাবে না। একটু উজান ধরে নামবে। স্রোত তোমাকে পিউয়ের দিকে নিয়ে যাবে।”

অর্ক মাথা নেড়ে জলে নামল।

মুহূর্তের মধ্যে স্রোত তাকে টেনে নিল। রশি শক্ত হয়ে উঠল। দুই পাড়ার মানুষ একসঙ্গে পিছিয়ে দাঁড়াল। অর্ক কোনোভাবে ভাঙা সাঁকোর কাছে পৌঁছে পিউকে ধরে ফেলল।

কিন্তু ফেরার সময় সাঁকোর বাকি অংশ ভেঙে তাদের ওপর পড়ল।

ঈশানী চিৎকার করে বলল, “রশি টানো!”

উত্তরপাড়া এবং দক্ষিণপাড়া একই সঙ্গে টানল।

সেই প্রথম দুই পাড়ার মানুষ পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে একই দিকে শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

অর্ক আর পিউকে যখন পাড়ে তোলা হলো, তখন অর্কের কপালের কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ছিল। পিউ কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল।

ঈশানী দৌড়ে গিয়ে অর্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

“কোথায় লেগেছে?”

অর্ক চোখ খুলে বলল, “সাঁকোর পরিদর্শন সম্পূর্ণ হলো?”

“চুপ করো।”

“রিপোর্টে লিখবেন, অস্থায়ী পরামর্শদাতা কাজে লাগে?”

ঈশানীর চোখে জল চলে এসেছিল। সে অর্কের ভেজা চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে রাগে বলল, “আর একবার এমন বীরত্ব দেখালে তোমাকে আমি নিজে খালে ফেলে দেব।”

অর্ক কষ্টের মধ্যেও হাসল।

“আপনিও কি সাঁতার জানেন?”

"খুব ভালো জানি।"

"তাহলে একসঙ্গে পড়লে সমস্যা নেই।"

ঈশানী বলল, "মাথায় আঘাতটা সম্ভবত বেশ জোরে লেগেছে। বাজে কথা বেড়ে গেছে।"

পাশ থেকে প্রবীরবাবু বললেন, "বাজে কথা আগে থেকেই বলত।"

হারাধনবাবু বললেন, "আজ অন্তত কাজে লাগিয়েছে।"

প্রবীরবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "তা অবশ্য ঠিক।"

হারাধনবাবু বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

"আপনি আমার সঙ্গে একমত হলেন?"

প্রবীরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "জরুরি অবস্থায় ভুল হয়ে যেতেই পারে।"

অ্যাম্বুল্যান্স আসতে দেরি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়ার রাস্তা থেকে একটি টোটো আনা হলো। টোটোটি ছিল দক্ষিণপাড়ার একজনের। সেটিতেই অর্ক ও পিউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেদিন কেউ ভাড়া, পাড়া কিংবা গাড়ির সামনের কাচে কোন ক্লাবের স্টিকার লাগানো আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করেনি।

৫. সেতুর নকশার বাইরে

“সেতু না বানিয়ে আপনাদের মতামত দুটি পাশাপাশি রাখলেই খাল পার হওয়া যেত। দুটিই বেশ লম্বা।”

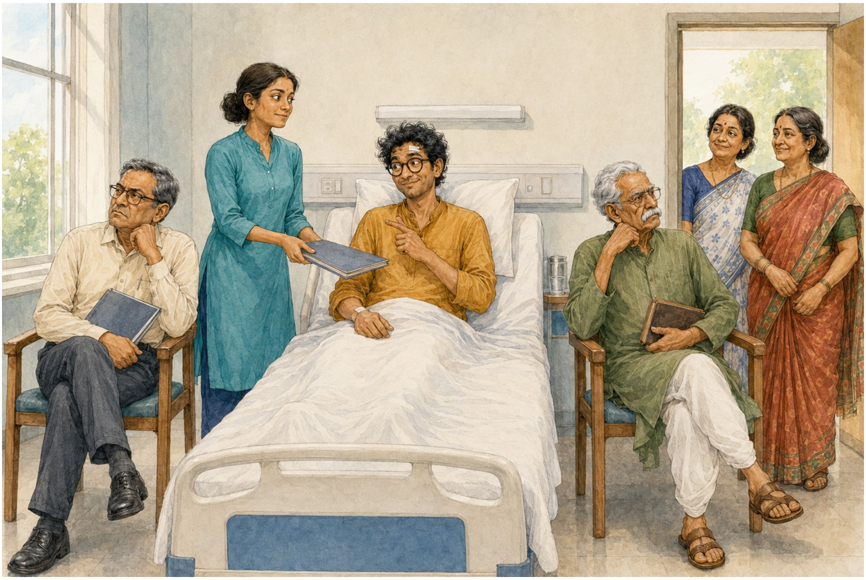

হাসপাতালের একটি বিছানা সাময়িকভাবে দুই পাড়ার শান্তি আলোচনার টেবিল হলো।

পিউকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি পাঠানো হলো। অর্কের কপালে ছয়টি সেলাই পড়ল। তবে বড় কোনো বিপদ হয়নি।

সন্ধ্যায় ঈশানী তাকে দেখতে গেল।

অর্কের বিছানার এক পাশে হারাধনবাবু, অন্য পাশে প্রবীরবাবু বসে ছিলেন। মাঝখানে অর্ক এমন মুখ করে শুয়ে ছিল, যেন তাকে চিকিৎসার জন্য নয়, দুই পাড়ার শান্তিচুক্তির জামিন হিসেবে ভর্তি করা হয়েছে।

ঈশানী ঘরে ঢুকতেই প্রবীরবাবু বললেন, “আমি শুধু ছেলেটাকে দেখতে এসেছি। এর মানে এই নয় যে পুরোনো সব বিষয় মিটে গেছে।”

হারাধনবাবু বললেন, “আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে বসিনি।”

অর্ক বলল, “দুজনেই দয়া করে বাইরে গিয়ে ঝগড়া করুন। মাথায় সেলাই পড়েছে। কানে নয়।”

দুজনেই একসঙ্গে বললেন, “চুপ করো।”

তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অর্ক বলল, “আপনারা চাইলে যুগলবন্দি করতে পারেন। গলার মিল ভালো।”

ঈশানী অর্কের হাতে একটি ফাইল দিল।

“কী?”

“সেতুর অনুমোদন।”

অর্ক উঠে বসার চেষ্টা করল।

“সত্যি?”

“হ্যাঁ। জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু হবে। তবে একটা শর্ত আছে।”

“কী শর্ত?”

“দুই পাড়াকে সংযোগপথের জন্য সামান্য করে জমি ছাড়তে হবে।”

প্রবীরবাবু বললেন, “আমরা দেব।”

হারাধনবাবু একটু দেরি করে বললেন, “আমরাও দেব।”

অর্ক বিস্মিত হয়ে দুজনের দিকে তাকাল।

ঈশানী বলল, “আজ পিউকে টেনে তোলার সময় আপনারা তো জিজ্ঞেস করেননি, রশির কোন অংশ কোন পাড়ার।”

প্রবীরবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, “জরুরি অবস্থার সঙ্গে সাধারণ অবস্থার তুলনা হয় না।”

হারাধনবাবু বললেন, “তবে সেতুটা দরকার।”

“সেটা আমিও জানি।”

“জানলে এতদিন বিরোধিতা করলেন কেন?”

“আপনি সমর্থন করেছিলেন বলে।”

“আমি বিরোধিতা করলে আপনি সমর্থন করতেন?”

“বিষয়টি বিবেচনা করা যেত।”

অর্ক বলল, “সেতু না বানিয়ে আপনাদের মতামত দুটি পাশাপাশি রাখলেই খাল পার হওয়া যেত। দুটিই বেশ লম্বা।”

দুজনের ঝগড়া আবার শুরু হওয়ার আগেই কণিকা এবং শর্মিলা ঘরে ঢুকলেন।

কণিকা বললেন, “তোরা কি আজও থামবি না?”

দুই পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন।

অর্ক ঈশানীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আসল প্রশাসন এসে গেছে।”

শর্মিলা ঈশানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমাদের সঙ্গে চল। কথা আছে।”

বাইরে বেরিয়ে তিনি কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন, “তোর অর্ককে ভালো লাগে?”

ঈশানী থমকে গেল।

“আমার অর্ক মানে?”

“বাংলা ভাষায় সম্বন্ধপদ নিয়ে পরে গবেষণা করিস। আগে উত্তর দে।”

“ও ভালো ছেলে।”

“ভালো ছেলে তো পিউয়ের স্কুলেও অনেক আছে।”

কণিকা মৃদু হেসে বললেন, “অর্কও বাড়িতে শুধু তোমার কথাই বলে।”

ঈশানী লজ্জা ঢাকতে বলল, “কী বলে?”

“বলে, উত্তরপাড়ার ইঞ্জিনিয়ার খুব বদমেজাজি।”

“শুধু এটুকুই?”

“আর বলে, বদমেজাজটা নাকি তার পছন্দ।”

ঈশানী বলল, “মাথায় চোট লাগার আগেও এসব বলত?”

কণিকা বললেন, “অনেক আগে থেকেই। তাই চিকিৎসা করে বিশেষ লাভ হবে না।”

শর্মিলা বললেন, “তাহলে কাজটা সেতুর সঙ্গেই হয়ে যাক।”

ঈশানী চমকে উঠল।

“কী কাজ?”

“দুই পাড়ার সঙ্গে দুই বাড়িরও যোগাযোগ।”

“মা, তোমরা এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কেন?”

শর্মিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কারণ আমাদের স্বামীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পেলে আরও তিরিশ বছর লাগাবে।”

কণিকা বললেন, “তার আগে বিয়ের মঞ্চের রং, নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা আর রান্না কোন পাড়ায় হবে, তা নিয়ে সভা করবে।”

শর্মিলা বললেন, “রেজিস্ট্রি হবে। অনুষ্ঠান পরে ভাবা যাবে।”

কণিকা মাথা নেড়ে বললেন, “এই একটি বিষয়ে আমরা আগেই একমত।”

ঈশানী বলল, “আমার মতামতের কোনো প্রয়োজন আছে?”

দুই মা একসঙ্গে বললেন, “আছে।”

তারপর শর্মিলা যোগ করলেন, “তবে খুব বেশি সময় নিলে আমরা খসড়া মতামত ধরে এগোব।”

সেতুর কাজ শুরু হওয়ার পরে দুই পাড়ার সহযোগিতার আসল পরীক্ষা শুরু হলো।

উত্তরপাড়া অভিযোগ করল, নির্মাণসামগ্রী দক্ষিণপাড়ার দিকে বেশি রাখা হয়েছে।

দক্ষিণপাড়া অভিযোগ করল, শ্রমিকেরা দুপুরের খাবার উত্তরপাড়ার দোকান থেকে কিনছে।

একদিন প্রবীরবাবু সিমেন্টের বস্তা গুনতে এলেন। পরদিন হারাধনবাবু এসে বালির আয়তন মাপলেন। তৃতীয় দিন দুজনেই একই সময়ে এসে হাজির হলেন এবং কে আগে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, তা নিয়ে তর্ক শুরু করলেন।

ঈশানী দুজনকে দুটি সুরক্ষা হেলমেট দিয়ে বলল, “কাজের জায়গায় এগুলো পরতে হবে।”

প্রবীরবাবু বললেন, “নীল হেলমেটটা আমি নেব।”

হারাধনবাবু বললেন, “হেলমেট সবুজ না হলে আমি পরব না।”

ঈশানী বলল, “দুটিই হলুদ।”

দুজন কিছুক্ষণ হেলমেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হারাধনবাবু বললেন, “এটা নিরপেক্ষ রং।”

প্রবীরবাবু বললেন, “সাময়িকভাবে মেনে নেওয়া যায়।”

সেদিন থেকে গ্রামের মানুষ তাঁদের নাম দিল ‘দুই হলুদ সভাপতি’।

তাঁদের সামনে অবশ্য কেউ নামটি উচ্চারণ করত না। অন্তত নিরাপদ দূরত্বে না গিয়ে নয়।

৬. উদ্বোধনের দিন

“দুজনের বক্তৃতা সেতুর নিচে রেখে দিলে বর্ষায় খালের জল আটকে যাবে।”

নতুন সাঁকোর প্রথম পথিক পিউ, আর পকেটে ফিরে গেল দুটি দীর্ঘ বক্তৃতা।

চার মাস পর সেতুর কাজ শেষ হলো।

সাদা রেলিং। নীল ডেক। দুই পাশে আলো। সংযোগপথে মাটি ফেলে উঁচু করা হয়েছে। এখন শিশুরা সারি বেঁধে নিরাপদে স্কুলে যেতে পারে।

নীল ডেক দেখে হারাধনবাবু প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। পরে তাঁকে বোঝানো হয়েছিল, সাদা রেলিংয়ের পাশে দুটি সবুজ আবর্জনার পাত্র রাখা হবে।

তিনি বলেছিলেন, "তাহলে ভারসাম্য কিছুটা রক্ষা পেল।"

আবর্জনার পাত্রের একটিতে উত্তরপাড়া এবং অন্যটিতে দক্ষিণপাড়ার নাম লেখা হবে কি না, সেই আলোচনা ঈশানী শুরুতেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

সেতুর নাম কী হবে, তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য হয়নি।

ফলকের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি তাই খালি রাখা হয়েছিল।

উদ্বোধনের সকালে দুই পাড়ার মানুষ আবার জড়ো হলো। প্রবীরবাবু এবং হারাধনবাবু দুজনেই আলাদা আলাদা উদ্বোধনী বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন। প্রতিটি বক্তৃতাই ছিল বারো পৃষ্ঠার।

প্রবীরবাবুর বক্তৃতার প্রথম চার পৃষ্ঠায় উত্তরপাড়ার ইতিহাস।

হারাধনবাবুর বক্তৃতার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় প্রবীরবাবুর ইতিহাসের ভুলগুলো সংশোধন করা হয়েছিল।

ঈশানী মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলল, "আজ কোনো দীর্ঘ বক্তৃতা হবে না।"

দুই সভাপতি একসঙ্গে আপত্তি করলেন।

প্রবীরবাবু বললেন, "আমার বক্তব্য মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের।"

হারাধনবাবু বললেন, "আমারটা আরও সংক্ষিপ্ত। বিরোধীপক্ষ বাধা না দিলে চল্লিশ মিনিটে শেষ হবে।"

অর্ক পেছন থেকে বলল, "দুজনের বক্তৃতা সেতুর নিচে রেখে দিলে বর্ষায় খালের জল আটকে যাবে।"

ঈশানী বলল, "প্রথমে পিউ সেতু পার হবে। তারপর সবাই।"

পিউ নতুন স্কুলব্যাগ কাঁধে সেতুর সামনে দাঁড়াল। অর্ক তার পাশে। কপালের ক্ষত শুকিয়ে সেখানে সরু একটি দাগ রয়ে গেছে।

পিউ সেতুর মাঝখানে গিয়ে থামল।

“দিদি, এর নাম কী?”

ঈশানী উত্তর দেওয়ার আগেই দুই পাড়ার মানুষ নিজেদের প্রস্তাব চিৎকার করে বলতে শুরু করল।

কেউ বলল, “জনকল্যাণ সেতু।”

কেউ বলল, “মৈত্রী সেতু।”

একজন বলল, “পিউ সেতু।”

পেছন থেকে আরেকজন চিৎকার করল, “সভাপতির নামটা থাকলে আপত্তি কী?”

সঙ্গে সঙ্গে দুজন সভাপতি নিজেদের জামার বোতাম ঠিক করতে শুরু করলেন।

পিউ কিছুক্ষণ সবার কথা শুনল। তারপর বলল, “এর নাম শুধু সাঁকো রাখলে হয় না?”

হারাধনবাবু বললেন, “এটা তো আর সাঁকো নয়। সেতু।”

পিউ বলল, “আগেরটা আমাদের ভয় দেখাত। তবু দুই পাড়াকে জুড়ে রাখত। এটাও তাই রাখবে। শুধু ভয় দেখাবে না।”

ভিড় আচমকা শান্ত হয়ে গেল।

অর্ক বলল, “নামটা মন্দ নয়। নতুন সাঁকো।”

ঈশানী খালি ফলকের দিকে তাকাল।

“তাহলে লেখা হোক, নতুন সাঁকো।”

প্রবীরবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, “নামটা খুব মর্যাদাপূর্ণ নয়।”

হারাধনবাবু বললেন, “তবে নিরপেক্ষ।”

“সে দিক দিয়ে মন্দ নয়।”

“এই প্রথম আপনার সঙ্গে একমত হলাম।”

“হাসপাতালেও একবার হয়েছিলেন।”

"সেটা জরুরি অবস্থা ছিল।"

প্রবীরবাবু বললেন, "এটাও নাম নিয়ে জরুরি অবস্থা।"

শেষ পর্যন্ত পিউ ফিতা কাটল। দুই সভাপতির বারো পৃষ্ঠা করে লেখা বক্তৃতা দুটি অক্ষত অবস্থায় তাঁদের পকেটে ফিরে গেল।

গ্রামের ইতিহাসে এটিই সম্ভবত উদ্বোধনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল।

বিকেলে ভিড় কমে এলে ঈশানী আর অর্ক পাশাপাশি হেঁটে সেতুর মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

খালের জল এখন অনেক নিচে। অস্তগামী সূর্যের আলো জলে ছোট ছোট আগুনের টুকরোর মতো ভাসছে।

অর্ক বলল, "একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"সেদিন হাসপাতালে আপনার মা আর আমার মা যা আলোচনা করছিলেন, আপনি জানেন?"

"জানি।"

"আপনার মত কী?"

ঈশানী রেলিংয়ে কনুই রেখে বলল, "প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না।"

"সমীক্ষায় কত দিন লাগবে?"

"কমপক্ষে এক বছর।"

"এত দিন?"

"মাটি পরীক্ষা করতে হবে। ভিত্তি ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। ভারবহন ক্ষমতা বুঝতে হবে।"

অর্ক মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক আছে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে যাতায়াত শুরু করা যায়?”

ঈশানী এবার হেসে ফেলল।

“তুমি সব বিষয়ে এত কথা বলো কেন?”

“আমার মুখ আছে বলে।”

“মুখ থাকলেই কথা বলতে হয় না।”

“আপনারও তো আছে।”

অর্কের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ঈশানী তার হাত ধরে ফেলল।

অর্ক নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, “এটা কি প্রাথমিক অনুমোদন?”

ঈশানী বলল, “শর্তসাপেক্ষ।”

“শর্তগুলো লিখিতভাবে পাব?”

“বেশি কথা বললে অনুমোদন বাতিল হবে।”

অর্ক সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

ঈশানী অবাক হয়ে বলল, “তুমি এত সহজে চুপ করতে পারো?”

“প্রকল্পটা গুরুত্বপূর্ণ।”

খালের দুই পারে তখন সন্ধ্যা নামছে। উত্তরপাড়ায় চাপাকলের শব্দ উঠছে। দক্ষিণপাড়ায় কেউ পুরোনো রেডিয়োতে গান চালিয়েছে। দুই দিকের আলাদা আলাদা শব্দ সেতুর মাঝখানে এসে এমনভাবে মিশে গেল যে কোনটা কোন পাড়ার, তা আর বোঝার উপায় রইল না।

ঠিক সেই সময় প্রবীরবাবুর গলা শোনা গেল।

“ঈশানী, বাড়ি যাবি না?”

অন্য প্রান্ত থেকে হারাধনবাবু বললেন, “অর্ক, তোর মা ডাকছে।”

অর্ক চাপা স্বরে বলল, “দেখলেন? আমরা দুজনেই একমাত্র সন্তান বলেই এই বিপদ।”

ঈশানী বলল, “চলো।”

দুজন হাত ছেড়ে দুই দিকে যেতে উদ্যত হলো। কয়েক পা এগিয়ে আবার থামল।

অর্ক বলল, “আপনি কোন দিকে যাবেন?”

ঈশানী বলল, “আজ দক্ষিণপাড়ায় যাই। কাকিমা ডেকেছেন।”

“আপনার বাবা?”

“সামলে নেব।”

“কীভাবে?”

ঈশানী তার হাত আবার ধরে বলল, “সেতু বানিয়েছি। ব্যবহারও তো করতে হবে।”

ওরা দক্ষিণপাড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পেছন থেকে প্রবীরবাবু চিৎকার করলেন, “রাতের খাবার কী হবে?”

শর্মিলার গলা ভেসে এল, “আমরাও ওদিকে যাচ্ছি। কণিকা খিচুড়ি করেছে।”

প্রবীরবাবু বললেন, “খিচুড়িতে চিনি দেয়নি তো?”

অন্য প্রান্ত থেকে হারাধনবাবু উত্তর দিলেন, “আগে এসে খেয়ে দেখুন। সব বিষয়ে দূর থেকে সন্দেহ করলে হবে?”

“আপনারা খিচুড়িতে চিনি দেন। ইতিহাসে প্রমাণ আছে।”

“আপনাদের পায়েসে নুন পড়েছিল বলে সব খাবার নিয়ে সন্দেহ করবেন না।”

“ওটা দুর্ঘটনা ছিল।”

“আপনার জীবনের অনেক মতামতকেই আমরা দুর্ঘটনা বলে মেনে নিয়েছি।”

প্রবীরবাবু গজগজ করতে করতে সেতুতে উঠলেন।

“আমি শুধু খিচুড়ি যাচাই করতে যাচ্ছি।”

হারাধনবাবু বললেন, “এক থালার বেশি যাচাই করতে দেওয়া হবে না।”

প্রবীরবাবু উত্তর দিলেন, “নমুনা ছোট হলে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য হয় না।”

তাঁর পেছনে শর্মিলা। উত্তরপাড়া থেকে আরও কয়েকজন। দক্ষিণপাড়া থেকেও মানুষ এগিয়ে আসছে।

কেউ খিচুড়ির খবর শুনে আসছে। কেউ নতুন সেতু দিয়ে সন্ধ্যায় হাঁটার জন্য। কেউ আবার শুধু দেখতে এসেছে, প্রবীরবাবু এবং হারাধনবাবু একই থালার বেগুনভাজা নিয়ে নতুন কোনো সীমান্তবিরোধ শুরু করেন কি না।

‘নতুন সাঁকো’ নামের সেতুটি নীরবে সবাইকে বহন করতে লাগল।

সেতুর নিজের কোনো পাড়া নেই। কোনো পক্ষ নেই। কে উত্তর থেকে আসছে আর কে দক্ষিণ থেকে, তা নিয়েও তার মাথাব্যথা নেই।

তার একমাত্র কাজ মানুষকে মাঝখানে এনে দেওয়া।

বাকি পথটুকু মানুষ চাইলে একসঙ্গে হাঁটতে পারে।

আর না চাইলে অন্তত একসঙ্গে বসে খিচুড়িতে চিনি দেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে ঝগড়া করতে পারে।

শেষ দৃশ্য

সেতুর কাজ মানুষকে মাঝখানে এনে দেওয়া। বাকি পথটুকু তারা চাইলে একসঙ্গেই হাঁটতে পারে।

লেখক পরিচিতি

অনাবিল সেনগুপ্ত পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। গল্প, প্রবন্ধ ও সমাজমনস্ক লেখালেখির পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, পরিবেশ এবং মানবিক অধিকারের বিষয়ে তিনি নিয়মিত কাজ করেন।

গ্রামবাংলার জীবন, ছোট সমাজের ক্ষমতার টানাপোড়েন, কৌতুক এবং মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা তাঁর লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত।

ওয়েবসাইট **anabilsengupta.com**

অলংকরণ ও নির্মাণ স্বীকৃতি

রচনা ও সৃজনদৃষ্টি

অনাবিল সেনগুপ্ত

সংস্করণ

পূর্ণ রঙিন সচিত্র ডিজিটাল সংস্করণ ২০২৬

চিত্রভাষা

বাংলা সম্পাদকীয় জলরং, গৌয়াশ ও সূক্ষ্ম কালি রেখার সমন্বয়

অলংকরণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়ক চিত্র নির্মাণ, মানব নির্বাচিত ও সম্পাদিত

বই নকশা

A5 সাহিত্যিক সচিত্র বিন্যাস, HarfBuzz সক্ষম বাংলা টাইপসেটিং

মুদ্রাক্ষর

Noto Serif Bengali

anabilsengupta.com

একটি সাঁকো, দুই পাড়া, অজস্র তর্ক

দুই পাড়ার মধ্যে একখানা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। তার চেয়েও নড়বড়ে দুই পাড়ার সম্পর্ক। সেতু বানাতে এসে ইঞ্জিনিয়ার ঈশানীর দেখা হয় পাঠাগারের অস্থায়ী পরামর্শদাতা অর্কের সঙ্গে। তারপর চেয়ার, সেতুর রং, নাম, সিঙাড়া না সমুচা এবং বহু পুরোনো অহংকার নিয়ে শুরু হয় এক হাস্যকর যুদ্ধ। বর্ষার জল একদিন সবাইকে একই দড়ি ধরতে শেখায়। নতুন সাঁকো প্রেম, প্রতিবেশ, সামাজিক ব্যঙ্গ এবং মানুষকে মাঝখানে এনে দেওয়ার গল্প।

অনাবিল সেনগুপ্ত

স্বপ্রকাশিত সচিত্র সংস্করণ ২০২৬

anabilsengupta.com